সেরা আশ্চর্য!
সেরা ফ্যানট্যাসটিক
দ্বিতীয় পর্ব

সম্পাদনা : অদ্রীশ বর্ধন

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
যৌথ প্রয়াস

সম্পাদকের কথা

বিশ্বের প্রথম সায়ান্স-ফিকশন সিনে ক্লাব এই কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে ছিল ভারতের প্রথম সায়ান্স-ফিকশন মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য!' যার প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ সালে। ১৯৭৫-এ বেরোয় 'ফ্যানট্যাসটিক'। প্রথম পত্রিকার একাধিক নামাংকন করেছিলেন বিমল দাস। দ্বিতীয় পত্রিকার নামাংকন করেন সত্যজিৎ রায়। বিমল দাসও মেতে উঠেছিলেন নামাংকনের খেলায়। পত্রিকার চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল প্রতিটি নামাংকনে।

এই চরিত্র যে শুধু কল্পবিজ্ঞানেই সীমিত থাকবে না, ফ্যানট্যাসি এবং ভূতের গল্পও পত্রিকায় ছাপা হবে এবং সিনে ক্লাবে দেখানো হবে—তা জানিয়েছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক সত্যজিৎ রায় এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র। ক্লাবের জেনারেল মিটিংয়েও তাঁদের এই নির্দেশ শোনা গেছিল।

এই দুই পত্রিকা থেকেই ৩০ বছরের গল্প উপন্যাস বাছতে গিয়ে তাই তাঁদের নির্দেশের কথা মনে রাখতে হয়েছে। ৩০ বছরে সমাদৃত হয়েছে এই সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত—আশা করা যায় এই সঙ্কলনেও তা হবে।

বইমেলা
২৬ জানুয়ারি, ১৯৯৪

অদ্রীশ বর্ধন

সূচিপত্র

উপন্যাস

আমি মানব একাকী	সুনেত্রা গুপ্ত	৪১
মামাবাবু ও ভূতুড়ে দ্বীপ	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২২০
সৌদামিনীর সোনার নৌকা	অখিল নিয়োগী	২৮৮

গল্প

অন্য মানুষ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৫
অপালা	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২৬
উত্তর	ফ্রেডরিক ব্রাউন	৭৩
চাচা	মঞ্জিল সেন	৭৭
জানলার বাইরে শাল গাছ	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩
দূরদৃষ্টি	ধনঞ্জয় ঘোষ	১০১
নয় বাই সাত বাই সাত	চিরঞ্জীব সেন	১০৯
ফিরে পাওয়া	অরূপরতন ভট্টাচার্য	১১৬
ফোর্থ ডাইমেনশন ট্যাবলেট	সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৯
ফ্যান্টাস্টিক! নয়?	নারায়ণ সান্যাল	১৩৪
বন্ধু	অদ্রীশ বর্ধন	১৪৪
বিজন দ্বীপে উড়ন পিপে	রণেন ঘোষ	১৬৪
ভৃগু মেলার সমাধিবাবা	প্রবীর ঘোষ	১৮০
এক অজানা গ্রহের কাহিনি	ভ্লাডিমির শোরবাকভ ভাষান্তর : ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী	১৯৫
মানবজাতির ছোটো ছোটো গল্প	জন স্টাইনবেক ভাষান্তর : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৭
মহিপালের মহাযাত্রা	সুমিতকুমার বর্ধন	২১৬
রোবনুষ	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫১

যে শহর প্রতিশোধ চায়	শ্রীধর সেনাপতি	২৫৮
রক্তপিশাচী	ই এফ বেনসন ভাষান্তর: দিলীপ দাশগুপ্ত	২৬৭
শব্দবিষ	অপূর্বকুমার ঘোষ	২৭৮
শব্দব্যবচ্ছেদ	অনীশ দেব	৩০৮
সাউন্ড মেশিন	মনোরঞ্জন দে	৩১৬

প্রবন্ধ

সত্যজিৎ রায়	কুব্রিক, ক্রফো ও S.F.	৭৫
সত্যজিৎ রায়	সায়েন্স ফিকশন ফিল্মের দু-চার কথা	৩৩১

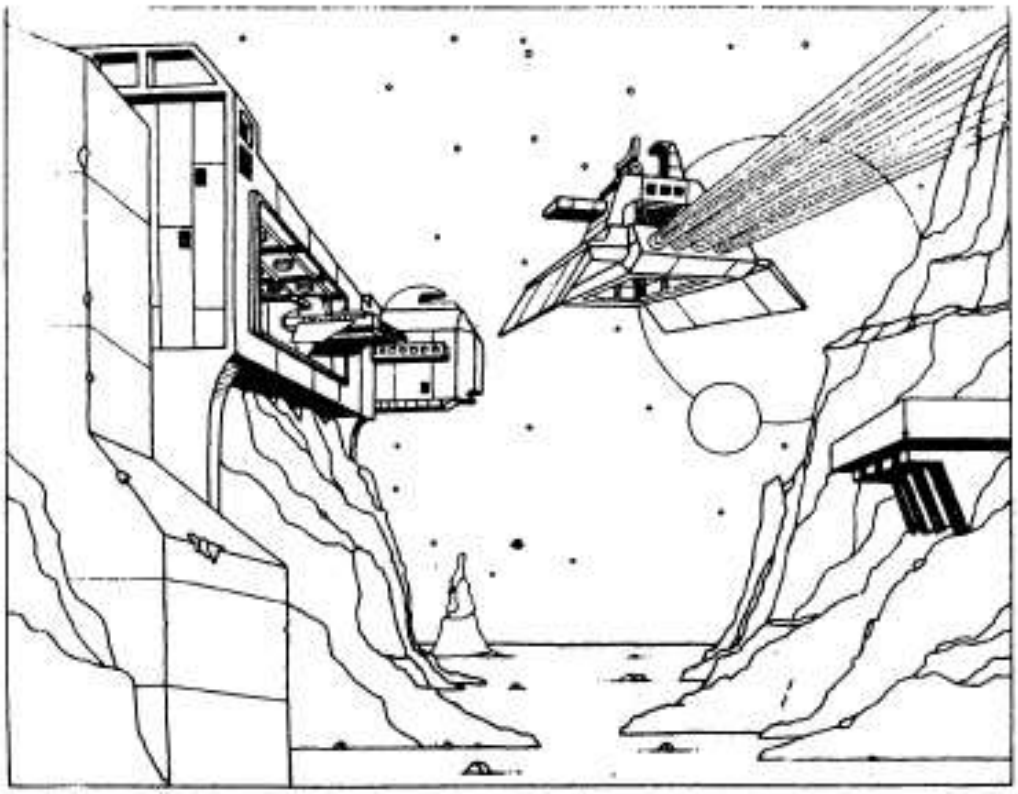

অন্য মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সোমেন রায়চৌধুরী রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু বেশি পান করা হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন ক্লাবে গিয়ে তিনি স্নুকার খেলেন আর তিন পেগ হুইস্কি খান। আজ এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে খেতে হয়েছে পাঁচ পেগ।

যা-ই হোক, তিনি সঠিকভাবেই গাড়ি চালিয়ে ফিরেছেন বাড়িতে। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে তিনি সদর দরজার কাছে এসে দেখলেন, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

লোকটির চেহারা তাঁর খুব চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু ঠিক ধরতে পারলেন না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

লোকটি দু-হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সোমেন রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্রে? কী ব্যাপার?

—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

—খুব চেনা-চেনা লাগছে। ঠিক ধরতে পারছি না।

—ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো।

সোমেন রায়চৌধুরী ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন তো বটেই, তারপর নিজের গায়ে খুব জোরে একটা চিমটি কাটলেন। তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে

আমি মানব একাকী

সুনেত্রা গুপ্ত

ওধারের নীল পাহাড়ের উপর দিয়ে সূর্য উঠছে। তাই প্রতিটি ঢেউখেলানো মাথা এক অদ্ভুত কমলা সবুজ টুপি পরেছে। এর আগে কখনও দেখিনি। এভাবে আমাদের গ্রহে সূর্যোদয় দেখিনি। এর আগে কোনোদিনও বাইরের বিষণ্ণ গোলাপি আলোর দিকে শূন্য চিত্তে তাকিয়ে সারারাতটা কাটাইনি। আমাদের গ্রহের শারীরতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করেছেন যে গোলাপি আলোতেই নাকি মানুষের নিদ্রা অনেক স্থির হয়। এই কারণে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে আদেশ করা হয়েছিল শহরের চারদিকের চাঁদের আবরণটাকে একটু মেজে-কেটে এমন পরিবর্তন করে দিতে, যাতে রাত্রিবেলায় চাঁদের আলো এক গোলাপি আভায় পরিণত হয়। কাজের ভার আমাদের সেই বুড়ো প্রফেসার—কর্মজগৎ থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও যিনি বারে বারে এসে আমাদের বিরক্ত করতেন—এই বিহ্বল গোলাপি কিরণের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অবশ্য চিরকালই ভদ্রলোকের উপর মায়া ছিল। মাঝে মাঝে দেখেছি তাঁকে পার্কে একলা বসে কাঁদতে। পার্কে ছেলে-টেলে ছাড়া কারোই বড়ো একটা যাতায়াত নেই—তা-ও যে ছেলেমেয়েরা বুদ্ধিতে একটু খাটো, তারাই সেখানে খেলাধুলা করে। যারা বুদ্ধিমান, তাদের তো আগেভাগেই শিক্ষা দিয়ে চোদ্দো-পনেরো বছরের মধ্যে উপযুক্ত কাজ দেওয়া হয়। মধ্যবয়স্ক ও প্রবীণেরা অধিকাংশ সময় কাজে ব্যস্ত থাকে—কর্মক্ষেত্রের গণ্ডির মধ্যেই তাদের সামাজিক লেনদেন। এতে অনেক সুবিধা আছে—যেমন, এই

উত্তর

ফ্রেডরিক ব্রাউন

আনুষ্ঠানিকভাবে সোনা দিয়ে শেষ কানেকশনটা শোলডারিং করে দিলেন ডর এভ। ডজনখানেক টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ চেয়ে রইল তাঁর পানে। ব্রহ্মাণ্ডে সাব ইথার ফুঁড়ে তাঁর ডজনখানেক ছবি ছুটে গেল চক্ষের নিমেষে।

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন ডর এভ। নড করলেন ডর রেনকে। এগোলেন সুইচটার দিকে—সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে কমপ্লিট হবে কনট্যাক্ট। পলক ফেলার আগেই ব্রহ্মাণ্ডের সব ক-টা বসতিপূর্ণ গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ সংস্থাপিত হবে—বিরানব্বই লক্ষকোটি দানবিক কম্পিউটিং মেশিন এক হয়ে যাবে একটিমাত্র সুপারসার্কিটের মধ্যে এসে—যুক্ত থাকবে একটিমাত্র সুপারক্যালকুলেটরের সঙ্গে—সব ক-টা ছায়াপথের যাবতীয় জ্ঞান জড়ো হবে এক এবং অদ্বিতীয় সিবারনেটিক্স মেশিনের মধ্যে।

কোটি কোটি শ্রোতা নিমেষহীন চোখে তাকিয়ে রইল ডর রেনের পানে। ক্ষণিক স্তব্ধ থেকে সংক্ষেপে বললেন ডর এভ, 'ডর রেন, সময় হয়েছে।'

সুইচ ঠেলে নামিয়ে দিলেন ডর এভ। দানবিক গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হল কয়েক মাইল লম্বা প্যানেল থেকে। আলোর ঝলক দেখা দিল ঘন ঘন। বিরানব্বই লক্ষকোটি গ্রহ থেকে ছুটে-আসা অবর্ণনীয় অকল্পনীয় শক্তি নিমেষে ফুঁসে উঠল প্যানেলগুলোর আড়ালে সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রজালে।

এক-পা পেছিয়ে এসে গভীর শ্বাস টানলেন ডর এভ। বললেন, 'ডর রেন,

চাচা

মঞ্জিল সেন

নিরাপত্তা পুলিশ যখন আমার শোবার ঘরে ঢুকল, তখন ভোররাত তিনটে বেজে কুড়ি। আমি ঘড়ি দেখেছিলাম।

কী ব্যাপার! আমি ঘুম-জড়ানো চোখে প্রশ্ন করলাম।

আসুন আমাদের সঙ্গে।

কেন?

খোলা দরজার সামনে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে মাথাটা ঝাঁকিয়ে পেছনদিকে কাউকে কিছু যেন ইঙ্গিত করল। এবার আমার চোখে পড়ল। আরেকজন পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রটা আমার দিকে তাক করে আছে। আমি বিছানা থেকে নেমে পড়লাম।

চোখে-মুখে জল দিতে পারব তো? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এখন নয়।

লোকটি অল্প কথার মানুষ। দ্বিতীয়জন গাড়িতে না-ওঠা পর্যন্ত মুখই খোলেনি। পেছনের আসনে আমরা তিনজন গদিয়ান হবার পর সে বলল, ঠিক আছে।

কথাটা গাড়ির ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলা।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

জবাবে ধাতব অস্ত্রটা আরও চেপে বসল আমার পাঁজরে।

অন্তত কী অপরাধে আমাকে ধরা হয়েছে তা জানবার অধিকার আমার আছে? নাছোড়বান্দার মতো বললাম আমি।

জানলার বাইরে শাল গাছ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় গ্রামের স্কুলে নকুলবাবু স্যার একটা কথা বলতেন। কিছু গাছ আছে, যাদের আয়ু মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখনও ওই গাছগুলোর শৈশব কাটে না। অর্থাৎ মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে যে ক-টা বছর লাগে, সেই ক-টা বছর কিন্তু গাছগুলো শৈশবের মধ্যেই থেকে যায়।

নকুলবাবু তখন দু-একটা গাছের নাম করতেন। ভুবনডাঙা হাইস্কুলের পেছনেই ছিল একটা শালের জঙ্গল। ক্লাস টেনের ঘরের জানলা থেকেই ওই শাল গাছগুলো দেখা যেত। লাল মাটিতে ছায়া ফেলে গাছগুলো সোজা দাঁড়িয়ে থাকত, আর আকাশের আলো-হাওয়া গায়ে মাখত অকাতরে। ক্লাসের বাইরে অজুর চোখ মাঝেমধ্যেই চলে যেত ওই শাল গাছগুলোর দিকে। ওর কেবলই মনে হত, গাছগুলোর ছায়াও সবুজ। হয়তো গাছগুলো ওদের জীবনীশক্তির অনেকটাই লাল মাটিতে ধার দিত। অজুর মনে হত, মাটির রং আর লাল নয়। সবুজ।

নকুলবাবু অবশ্য বলতেন, এক-একটা গাছ এক-একরকম আবহাওয়ায় বড়ো হয়। সব গাছ সব জায়গায় জন্মায় না। মাটিরও একটা গুণ থাকে। তবে শুধু মাটির গুণ থাকলেই তো হল না, গাছকেও বড়ো হতে হয়। একটা করবী গাছ, কিংবা দোপাটি গাছের চেয়ে শাল গাছের শক্তি যে অনেক বেশি তা নিশ্চয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। এসব নকুলবাবুর কথা। আজও ওই কথাগুলো ভোলেনি অজু।

সায়েন্স ফিকশন ফিল্মের দু-চার কথা

সত্যজিৎ রায়

সায়েন্স ফিকশন এবং স্পাইয়ের গল্প নাকি আজকাল ক্রমশই রহস্য-রোমাঞ্চের হালকা গল্পের জায়গা দখল করে বসছে। আমি জানি না স্পাই গল্পের বাজার কেন এত গরম—জেম্স বন্ড বোধহয় এর কারণ—তবে যে যুগে দ্রুত বিজ্ঞান-কারিগরির উন্নতি হচ্ছে, অতি সাধারণ মানুষেরও চোখের সামনে অতি নিকট থেকে তোলা চাঁদের ফোটো নতুন কল্পনার জগৎ মেলে দিচ্ছে, মহাকাশচারীকে মহাশূন্যে ভারহীন অবস্থায় ভাসতে দেখা যাচ্ছে, সে যুগে সায়েন্স ফিকশনের অভ্যুদয় হবেই।

সায়েন্স ফিকশন নতুন কিছুই নয়। যে রূপে আজ এ জিনিস আমরা দেখছি, অন্তত এক শতাব্দী আগেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, জুল ভের্নের 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' উপন্যাসে তার সূচনা। ভের্ন প্রথমদিকে একাই এ নিয়ে চর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন, এরপর এইচ জি ওয়েল্স 'দ্য টাইম মেশিন' নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর বিখ্যাত ডজনখানেক গল্পকল্প অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পরিবেশন করলেন।

বলতে পারা যায়, বর্তমান শতকের প্রথম দশ-বারো বছরের শেষ থেকেই এই নতুন সাহিত্যশাখা শেকড় গাড়তে শুরু করে, এবং তখন থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে এর সমৃদ্ধি বিকাশ চলতে থাকে। আজ এর যে ফুলে-ফলে বাড়বাড়ন্ত দেখছি, তা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগের বিস্ময়াবহ ব্যাপার, যার মধ্যে আমেরিকা,